মসনদে মোশতাক

হিস্টরিক্যাল ট্রান্সপারেন্সি সোসাইটি
সম্পাদনা পর্ষদ

ঐতিহ্য

উ ৎ স র্গ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের
যেকোনো উৎসুক গবেষক

ভূমিকা

মোশতাক– বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত-সমালোচিত নাম। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার একদম কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন এই ব্যক্তি। ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তার ভূমিকা নিয়ে আছে নানা বিতর্ক। ইতিহাসে তাকে নিয়ে আছে নানা মূল্যায়ন।

তিনি ৮১ দিন বাংলাদেশের শাসনভার সামলিয়েছেন। এই ৮১ দিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম গবেষণা করা হয়েছে। ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫ থেকে পরিবর্তিত বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য এই ৮১ দিনকে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। আসলেও বাংলাদেশ পাকিস্তানি ভাবধারায় চলে গিয়েছিল কিনা, কিংবা কেমন ছিল সে সময়ের নাগরিক জীবন বা রাষ্ট্রপরিচালনার ধরন– এগুলো নিয়ে আগে কখনো একক বই বের হয়নি।

সেই ধারাবাহিকতায় আমরা চেষ্টা করেছি এই আলোচিত ৮১ দিনের সমস্ত খবরাখবরের একটা সংকলন গ্রন্থ বের করার। বইটিতে সেসময়ে প্রকাশিত মূলধারার পত্রপত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমরা আশা রাখি, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের নবীন বা প্রবীণ যেকোনো গবেষক এই বইটিকে ইতিহাসের অনন্য দলিল হিসেবে গণ্য করতে পারবেন। ভবিষ্যৎ গবেষকবৃন্দ এখান থেকে পেতে পারেন নানা সূত্র। তাদের জন্যই আমাদের এ শ্রম।

এমন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বই ছাপার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে পাশে পেয়ে আমরা আনন্দিত।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই বইয়ের ব্যবহৃত পত্রিকাসমূহ ও তথ্যের উৎসসমূহ অনেক পুরানো হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। যেখানে উদ্ধারে সম্ভব হয়নি সেখানে (...) দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে,
হিস্টরিক্যাল ট্রান্সপারেন্সি সোসাইটি

সূচি

পরিচিতি ১৩
দৈনিক ইত্তেফাক ২৯
সম্পাদকীয় ৩১
দৈনিক বাংলা ২৩৫
সংবাদ ৪১১

প্রেসিডেন্ট মোশতাক

পরিচিতি

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর আসুন দেখি ১৫ই আগস্টের পর প্রথমত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কী কী প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিঘটনা ঘটেছিল। দেশে যেহেতু প্রেসিডেন্ট তথা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নিহত হয়েছেন স্বভাবতই ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এটি বহুল চর্চিত যে এই শূন্যতার বিপরীতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন তৎকালীন প্রভাবশালী বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। একথা না বললেই নয় যে একজন ইতিহাস পড়ুয়া হিসেবে মোশতাকের রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত যদি আপনি পড়েন ও জানেন তবে তাকে আওয়ামী মূলধারার রাজনীতির একজন প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করা লাগবে। সেটি স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর কালেও। আইয়ুব খানের শাসনামলে গ্রেপ্তার, ৬৬ এর ৬ দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অবস্থান কিংবা ৭১ এর অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ও ইনার সার্কেল এর সদস্য হিসেবে এটাই প্রতীয়মান হয়। একই কথা আপনি যদি ৭২ থেকে ৭৫ এর ১৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত তাকে দেখেন তবে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ‘মুজিবস ম্যান’ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

মুজিব নিহত হওয়ার পর তার সরকারের স্ট্রাকচার কীরূপ ছিল কিংবা মুজিব মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী, আপাত মুজিব লয়ালিস্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের কার্যক্রম কীরূপ ছিল তা জানা দরকার। সেসময় বঙ্গভবনে দ্রুততার সাথে নতুন সরকার গঠিত হয়।

মুজিব হত্যা পরবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে মোশতাককে ভর্ৎসনা করা হলেও তিনি তো ছিলেন অনেক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ভিড়ে একজন বাণিজ্যমন্ত্রী। আওয়ামী লীগের মুজিব লয়ালিস্ট তৎকালীন তথ্য, আইন,

বিচার, খাদ্য, শিক্ষা মন্ত্রীদের কি সমভাবেই ভর্ৎসনা করা উচিত কি উচিত নয়– পাঠকের মনের এ প্রশ্ন আমাদেরকেও বারবার ভাবিয়েছে।

মুজিব সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথেও তার নাম জড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা তার হাত ধরেই সূচিত হয়েছিল। আবার আমরা কি কখনো প্রশ্ন করেছি মুজিব সরকারের প্রভাবশালী খাদ্য ও ভূমিমন্ত্রী কে ছিলেন? তিনি ছিলেন শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার। মোশতাক মন্ত্রিসভার ছবি যদি আপনি দেখেন সেখানে তাকে শপথ নিতে দেখবেন।

মুজিব কেবিনেটে প্রভাবশালী আইন ও বিচার মন্ত্রী হিসেবে ছিলেন প্রবীণ শ্রী মনোরঞ্জন ধর। মুজিব লয়ালিস্ট হিসেবে সুপরিচিত জনাব মনোরঞ্জনই ছিলেন মোশতাক কেবিনেটে আইন ও বিচার মন্ত্রী। শেখ মুজিবের খুনিদের বিচার করা যাবে না– এই মর্মে জারীকৃত সেই কুখ্যাত ইমডেমনিটি বা দায়মুক্তি অধ্যাদেশ যখন হয় তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন মুজিবেরই আইনমন্ত্রী জনাব মনোরঞ্জন সাহেব। যদিও ইতিহাসের কিছু কিছু বয়ানে শ্রী ফণিভূষণ ও শ্রী মনোরঞ্জন চাপের মুখে মোশতাক কেবিনেটে যোগ দিয়েছিলেন এমন দাবি পাওয়া যায়, তথাপি তাদের কারোরই পরবর্তী জীবনে মোশতাক সরকারে জোরপূর্বক যোগদানের ব্যাপারটি নিয়ে অনুশোচনা তো দূরে থাক, বিষয়টিকে তারা ভোকালি এড্রেস করেছেন এমন কোনো ঠোস প্রমাণ হাতের নাগালে পাওয়া যায় না।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব মুজিব যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আবদুল মান্নান। মুজিব লয়ালিস্ট আবদুল মান্নান ১৫ই আগস্টের পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। মোশতাক কেবিনেটের বিজ্ঞান ও আণবিক শক্তি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন মুজিবের অনুগত শিক্ষাবিদ ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। আপনাদের কারো বাড়ি কি নেত্রকোণাতে? তাহলে নিশ্চয়ই জানার কথা নেত্রকোণার এমপি আব্দুল মোমিনের কথা। মোশতাক মন্ত্রিসভায় তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য ১৯৯৬ সালে মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা তাকে আওয়ামী লীগেরই এমপি করেছিলেন। এমনকি মোমিনের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী রেবেকা মোমিনকে টানা তিনবার এমপি করেছিলেন শেখ হাসিনা।

তাহলে নতুন প্রজন্ম এই ইতিহাস জানার পর একটি প্রশ্ন করতেই পারে– মুজিব কন্যাই কি যেই কেবিনেটকে ডিজঅউন করেন সেই কেবিনেটের মেম্বার

ও সেই পরিবারের সদস্যকে এমপি করেছেন? ইতিহাস থেকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলা আরেক নাম সোহরাব হোসেন। বৃহত্তর যশোরের আওয়ামী লীগের রাজনীতি বিকশিত হয়েছিল তার হাত ধরে। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক এবং মুজিব সরকারের ক্ষমতাধর মন্ত্রী। মোশতাকের গণপূর্ত মন্ত্রী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এই সংগঠক।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে আবু সাঈদ চৌধুরীর নাম। স্বাধীনতা উত্তরকালে একটি পর্যায়ে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সরিয়ে মুজিব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। ইতিহাসের কিছু কিছু বয়ানে এমন পাওয়া যায় যে আবু সাঈদ চৌধুরী সৈয়দ নজরুল ইসলাম অপেক্ষা অধিকতর মুজিব লয়ালিস্ট ছিলেন বলেই এরকম পদায়ন হয়েছিল। তিনি মুজিব মন্ত্রিসভারও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। গেস হোয়াট? মোশতাক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যার হাতে মোশতাক সরকারকে বিদেশে রিপ্রেজেন্ট করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তিনি হলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এই আবু সাঈদ চৌধুরী।

একথা অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর একটি। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনকারী আজিজুর রহমান মল্লিক ছিলেন মোশতাকের অর্থমন্ত্রী। গেস হোয়াট? ৭৪-৭৫ এ তাজউদ্দীনকে সরিয়ে মুজিব নিয়োগ দিয়েছিলেন আজিজুর রহমান মল্লিককেই। একথা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় তাজউদ্দীন এর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে যিনি এসেছিলেন তিনি যথেষ্ট মুজিব লয়ালিস্ট ছিলেন।

নতুন প্রজন্মের কাছে একটি কনফিউজিং ক্যারেক্টার হতে পারেন আতাউল গণি ওসমানী। কেন আসেন দেখি। একে তো তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ৭২ থেকে ৭৫-এ বিভিন্ন পলিসি মেকিংয়ে তিনি যেমন ছিলেন তদ্রূপ মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাও ছিলেন, আবার মোশতাক পরবর্তী জীবনে আতাউল গণির নানাবিধ বিচরণের ইতিহাসও কৌতূহলোদ্দীপক। মুজিব আমলের রাষ্ট্রপতি ছিলেন মোহাম্মদউল্লাহ। কেউ কেউ বলেন বাকশাল গঠনের পিছে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই তিনিই কিনা হলেন মোশতাকের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এবার আসি প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রীদের বেলায়। দেওয়ান ফরিদ গাজীর কথা না বললেই না। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুজিবের সহযোদ্ধা এই ব্যক্তিটি মুজিব সরকারের এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী যেমন ছিলেন তেমনি

মোশতাক কেবিনেটেরও প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনাই তাকে দলে ফিরিয়ে নেন এবং আওয়ামী লীগের এমপি করেছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আরও ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য ডাক্তার ক্ষিতিশ চন্দ্র মণ্ডল এবং মুজিব সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী কেবিনেট সদস্য নুরুল ইসলাম চৌধুরী। এই ক্লাবে আরও আছেন সৈয়দ আলতাফ হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম, নুরুল ইসলাম মঞ্জু।

এনাদের পরবর্তী জীবনের রাজনীতি আরও বৈচিত্র্যময়। যেটি নিয়ে আলোচনা হবে সামনের কোনো একদিন।

বঙ্গভবনের সেই বিতর্কিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লা, নৌবাহিনীর প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার। পুলিশের আইজি এ এইচ নুরুল ইসলাম এবং আরও আশ্চর্যজনকভাবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত চিফ আবুল হাসান খান।

পরবর্তী দিনসমূহের পত্রিকাগুলোতে এই বিতর্কিত শপথ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে 'নতুন বিপ্লব এবং নতুন দেশ ও স্বপ্নের সূচনা' এই থিমে অজস্র সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ বলেন এই সমস্ত সম্পাদকীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথাপি ইতিহাসের বিশ্লেষণে এই সম্পাদকীয়গুলোর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এর পাশাপাশি এত এত পেশাজীবী, মুক্তিযোদ্ধা ও সামাজিক সংগঠন কালবিলম্ব না করে মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানায়। আজ সময় এসেছে এই ঘটনাকে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণের। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে এটি আমাদের প্রত্যাশা।

একই সাথে এখানে আরও একটি ক্যারেক্টারের কথা আনা প্রয়োজন। তিনি হলেন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। তিনি ১৯৫৬-৬৭ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ভেটারান আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত এই নেতাই খন্দকার মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানান এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এই সরকারের জন্য। রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোশতাক চিকিৎসারত অসুস্থ ভাসানীকে নিজে পিজি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। পবিত্র শবেকদর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট মোশতাক। এ ভাষণের প্রতি উত্তরে বাণী দেন মওলানা ভাসানী। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তিনি জনগণের প্রতি প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ওনার সাথে বৈঠক করেন, আরও বৈঠক করেন মুজিব আমলের প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ স্পিকার মালেক উকিল। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় মশিউর রহমান জাদু মিয়া এবং অলি আহাদের মতো রাজনীতিবিদদের।

পরিশেষে আরও একজন প্লেয়ারের কথা একটু বলতেই হয়। কারণ হাসিনার ১৫ বছরের কুখ্যাত রেজিমে আমরা দেখেছি তথ্য মন্ত্রণালয়ে যিনি থাকেন তিনি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার। মুজিব আমলে কে ছিলেন সেই ব্যক্তি। দ্য নটোরিয়াস তাহের উদ্দিন ঠাকুর। ৭২ থেকে ৭৫ এর মিডিয়াগুলো খুললেই আপনি দেখবেন উচ্চ গ্রীবা ও প্রকাণ্ড লম্বা এই মানুষটিকে। মজার ব্যাপার হলো মোশতাকের শাসনকালেও ধারাবাহিক উপস্থিতি দেখা গেছে এই তাহেরের, অর্থাৎ তিনি ছিলেন মোশতাকের তথ্য প্রতিমন্ত্রী। একাধিক দলিলে মুজিব হত্যায় তার সংশ্লিষ্টতা দাবি করা হয়। সো, এই নটোরিয়াস পলিটিশিয়ানকে বুঝতে হবে বিভিন্ন লেন্স থেকে।

এক্ষেত্রে একটি প্রাসঙ্গিক ইস্যু উল্লেখ না করলেই নয়, মোশতাকের ৩ মাসের শাসনামলে সেই সরকারের ব্রেইন চাইল্ড অন্যতম একটি প্রকল্প ছিল স্বনির্ভর বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষণায় জিয়ার খাল কাটা কর্মসূচি কিংবা মুজিবের বাকশালের দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির তুলনায় এই প্রকল্পটি বলতে গেলে অনুক্ত থেকে গেছে। সুতরাং এটির ভালোমন্দ বিচারবিশ্লেষণের পক্ষ বিপক্ষ মতামত সমকালীন ডিসকোর্সে অনুপস্থিত। তবে কিছু বিবেচনাযোগ্য তথ্য উল্লেখ করার মতো। যেমন রংপুর জেলার দুর্গাপুর গ্রামে নূর মোহাম্মদ মণ্ডল এই প্রকল্পের অধীনে রংপুর জেলার ৬৩টি গ্রাম স্বনির্ভর করেছিলেন। যেটি ছিল তৎকালীন সাংবাদিকদের অন্যতম আকৃষ্টের বিষয়।

এবার মোশতাক সরকারের পলিসিগত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা জরুরি। যেমন জয় বাংলার পরিবর্তে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ স্লোগান চালু। পাশাপাশি বিবিসি বাংলার রিপোর্ট অনুযায়ী পনেরোই আগস্টের পরের প্রথম সপ্তাহে রেডিও ও টেলিভিশনে জাতীয় সংগীত ছাড়া রবীন্দ্রসংগীত এবং ভগবদ্‌গীতা পাঠ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যদিও কিছুদিন পরে আবার তা চালু হয়।

ফলে দেশটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হতে যাচ্ছে বলে প্রথম দিকে পাকিস্তান এবং সৌদি আরব যে ধারণা করেছিল, সেটি ভুল বলে প্রতীয়মান হয়।

পাশাপাশি ঢাকায় এ সময় মহাসমারোহে শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে জ্যোতি পাল মহাথেরো ৩ সদস্য নিয়ে মোশতাকের সাথে দেখা করেছিলেন। মোশতাক সরকার দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২ দিন ছুটি ঘোষণা করেছিল।

২০শে আগস্ট সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। তবে ঘোষণায় বলা হয়, এটি কার্যকর হবে ১৫ই আগস্ট থেকে। সেদিন দৈনিক ইত্তেফাক শিরোনাম করেছিল, 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ'।

সেদিন আরও একটি আদেশ জারি করেন খন্দকার মোশতাক। শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির যে আদেশে মেজর ডালিম এবং মেজর নূরকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দিয়েছিলেন, ২২শে আগস্ট সেই নয় নম্বর আদেশ বাতিল করা হয়। পরের দিনের দৈনিক বাংলায় এটাই ছিল শিরোনাম। এর আগে ২২শে আগস্ট অবৈধ সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগ এনে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের ২৬ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের বেশিরভাগ ছিলেন আগের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ।

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে আরও জানা যায় 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক' বইতে মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী লিখেছেন, ক্ষমতায় এসেই এই সরকার তাড়াহুড়ো করে সামরিক বাহিনীতে পরিবর্তন আনে। জেনারেল ওসমানীকে (এমএজি ওসমানী) একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা করা হলো।

উপ-সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হয়। আর পূর্বতন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাকে অব্যাহতি দিয়ে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয় রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য।

বাকশাল ব্যবস্থা আগেই বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর ৩০শে আগস্ট আরেকটি অধ্যাদেশ জারি করে দেশে রাজনৈতিক দল বা কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

তবে পরে অক্টোবর মাসে একটি বেতার ভাষণে খন্দকার মোশতাক ঘোষণা দেন, ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবং ১৯৭৬ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করা যাবে।

এর আগে আওয়ামী লীগের সরকার দেশের ১৯টি জেলাকে বিভক্ত করে ৬১টি জেলায় রূপান্তর করে গভর্নর নিয়োগের পরিকল্পনা করেছিল। তখন

২৮শে আগস্ট সেই ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় ১৯টি জেলা চালু করে জেলা প্রশাসকদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সেইসঙ্গে আটককৃত আওয়ামী লীগ ও বাকশালের নেতাদের বিচারের জন্য কয়েকটি সামরিক বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত আদালত গঠন করা হয়। আদেশে বলা হয়, দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বেআইনি অস্ত্র রাখার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। সেই সময় সেনা সদরে ক্যাপ্টেন হিসাবে কাজ করতেন মেজর জেনারেল (অব) মুহাম্মদ ইবরাহিম। 'সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর' বইতে তিনি লিখেছেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত দুই মাস ১৮ দিন সেনাবাহিনী অনেকটা দ্বৈত কমান্ডে চলেছিল। আমরা যারা জুনিয়র ছিলাম, তারা কোনমতেই বুঝতে পারছিলাম না যে, দেশ বা সেনাবাহিনী কীভাবে চলছে বা কাজ করছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময়টিতেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি বা IDA রেকর্ড পরিমাণ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। পাশাপাশি ইউনিসেফও বাংলাদেশের শিশু কল্যাণে বিনিয়োগে ব্যাপক অর্থ দেওয়ার কমিটমেন্ট দেয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা কেয়ার ১৫ লাখ মার্কিন ডলারের সাহায্য চুক্তি করে।

বৈশ্বিক রেস্পন্সের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল চলে আসে বড় বড় প্লেয়ার দেশগুলোর রেস্পন্স কেমন ছিল। আগস্ট ১৬ তারিখের মধ্যেই সৌদি আরব নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ঠিক ঐ সময় সুদানের প্রেসিডেন্ট নুমেইরি সৌদি ভ্রমণ করছিলেন। সৌদি বাদশাহ খালিদ এবং নুমেইরি সেখান থেকে মোশতাককে অভিনন্দন বার্তা পাঠান। বিগ প্লেয়ারদের মধ্যে ব্রিটেন এবং জাপান দ্রুততার সাথে মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানায়। উল্লেখ্য, এই দুটি দেশের সাথে মুজিব সরকারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মুজিব চিকিৎসার জন্য ব্রিটেন যেতেন। এই ব্রিটেনের প্রভাবশালী হাইকমিশনার বি জি স্মলম্যান মোশতাকের সাথে বৈঠক করেন। বাংলাদেশের প্রধান হিসেবে সপরিবারে জাপানে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়েছিলেন মুজিব। বাংলাদেশের তৎকালীন জাপানি রাষ্ট্রদূত তাকাশি কোয়ামাদা সরাসরি মোশতাককে অভিনন্দন জানান এবং এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানান। শেখ মুজিবের সাথে সুসম্পর্ক থাকা স্বয়ং উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল ইদি আমিন মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানান।

২১শে আগস্ট এএফপির প্রতিবেদনে পাওয়া যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোশতাককে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেসময় ঢাকার ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী কূটনীতিক হিসেবে বিবেচিত হতেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার। তিনি মোশতাকের সাথে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পায়চারি করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি আর বসে থাকবে? তৎকালীন সোভিয়েত চার্জ দি এফেয়ার্স জি কে গ্রাওসেতস্কি মোশতাকের সাথে বৈঠক করেন।

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী রাওলিং ঢাকার সাথে সুসম্পর্কের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মুজিব সরকারের সাথে সুসম্পর্ক থাকা একটি দেশ ছিল মালয়েশিয়া। আওয়ামী মন্ত্রীদের সাথে তৎকালীন মালয়েশীয় রাষ্ট্রদূতের যেকোনো সৌজন্য সাক্ষাৎ বা বৈঠকই গুরুত্বের সাথে সব পেপারে ছাপানো হতো। সেই মালয়েশিয়ারই পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিংকু রিথা উদ্দিন মোশতাক সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা দেন। সমর্থন আরও দেয় নেপাল, ব্রাজিল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড ও বুলগেরিয়া । আফ্রিকার বিখ্যাত নেতা এবং মোজাম্বিকের কিংবদন্তি প্রেসিডেন্ট সামুরা মেচেল, কুয়েতের মন্ত্রিপরিষদ, ইয়েমেনের কমান্ড কাউন্সিল প্রধান ইব্রাহিম মোহাম্মদ আলহামদি দ্রুততার সাথে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন। আরও ছিল জর্ডান এবং মিয়ানমার। ২২শে আগস্টে ঢাকাস্থ প্রভাবশালী কূটনীতিকবৃন্দ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানেরা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সাথে এক আনন্দঘন পরিবেশে হাসিমুখে করমর্দন করেন। নবীন ইতিহাস পাঠকদের কাছে এটিও ভাবনার বিষয়।

তখন ভারতের রেস্পন্সগুলো বেশ মজার। ভারত সরকারের এক মুখপাত্রের বয়ান দিয়ে বাংলাদেশ টাইমস প্রতিবেদন দেয় যে ভারত বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব অব্যাহত রাখতে চায়। ১৫ই আগস্ট দেশে না থাকলেও গাড়িতে চেপে কলকাতা হয়ে ১৬ই আগস্ট দেশে ফিরেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন। আগস্টের ৮ তারিখ থেকে তিনি নয়াদিল্লি অবস্থান করছিলেন। ১৮ই আগস্ট ভারতের এই প্রভাবশালী কূটনীতিক মোশতাকের সাথে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেন।

ইতিহাসের বয়ান অনুযায়ী, এক খণ্ড কাগজ হাতে সমর সেনকে সরাসরি প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের সান্নিধ্যে দেখা যায়। মোশতাক দাঁড়ানো থাকতেই ভারতীয় হাইকমিশনার তার কূটনৈতিক নোট পড়ে শোনান। মোশতাক এরপর বিমর্ষ মুখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন।

ওই কাগজে লেখা ছিল, 'যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করা হয় এবং কোনো দেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করা হয়, তাহলে ভারতের সাথে থাকা বৈধ চুক্তির আওতায় ভারতের সেনাবাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু আপনি যদি নাম পরিবর্তন এবং তথাকথিত কনফেডারেশনের ধারণা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে ভারত ১৫ই আগস্ট থেকে যাই ঘটুক না কেন, তাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করবে।' ভারতের কলকাতার দ্য স্টেটসম্যানের সম্পাদক মানস ঘোষ এভাবেই ২০১১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এক নিবন্ধে সে সময়কার পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে মোশতাক বন্ধুত্বের আহ্বান নিয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমানকে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনেও মোশতাক সরকারের নিয়মিত উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। ন্যাম সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, জেনেভা কনফারেন্সে শিক্ষামন্ত্রী মোজাফফর আহমদ চৌধুরী মোশতাক সরকারকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন।

স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশের বিরোধিতা করে যাওয়া চীন শেখ মুজিব মারা যাওয়ার পর ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

শেখ মুজিব মারা যাওয়ার পরে স্বভাবতই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পাকিস্তানের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মোশতাক সরকার-পাকিস্তান এই কানেকশন নিয়ে ইতিহাসে পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত আছে। রয়টার্স এর বরাত দিয়ে আগস্টের ১৭ তারিখে বলা হয় পিন্ডি-ঢাকা সম্পর্ক উন্নয়ন দ্রুততার সাথে হবে। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. বোস্টার তার বার্তায় লিখেছেন, 'গত সন্ধ্যায় (২৬শে আগস্ট) বাংলাদেশ বেতার একটি খবর প্রচার শুরু করে....ওই বার্তায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর কাছে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রেরিত পত্রের একটি বয়ান রয়েছে।'

'খবরে উল্লেখ করা হয় যে, ভুট্টো এর আগে মোশতাকের কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, এটি তার জবাব। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং উপমহাদেশের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ দেখতে আগ্রহী।'

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মরক্কো, ইরান ও কাতার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। মোশতাক সরকারের সময়ে পাট শিল্প সংস্কারে অনেক দ্রুত

পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক তোড়জোড়ও দেখা যায়।

৭২-৭৫ পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকা বেশ কিছু পেপার পত্রিকাকে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চট্টগ্রামের প্রাচীনতম পত্রিকা দৈনিক আজাদী। পুনঃপ্রকাশের অনুমতির পাশাপাশি সরকার এটিকে ন্যায়সংগত মালিকের হাতে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত পত্রিকা ইত্তেফাক তার 'ন্যায়সংগত' অধিকারীদের কাছে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত হয়। দৈনিক সংবাদের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে পাট বিক্রি বৃদ্ধি, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি, নদীভাঙন রোধে নেদারল্যান্ডসের সাথে পার্টনারশিপ তৈরি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান ও দুর্নীতিবাজ সচিবদের বরখাস্ত, ছিন্নমূল পুনর্বাসন কর্মসূচি, মৎস্য চাষ অভিযান, সিমেন্ট ও কাপড়ের মূল্যহ্রাস, বস্ত্র শিল্পের বিকাশ, টিসিবিতে ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে টিসিবি কার্যক্রমের প্রসার, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ, ভেজা পাট বিক্রির চেষ্টায় জরিমানা; বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, সাঁতার ও এথলেটিক্স চর্চার প্রসার, বসন্তের ভয়াবহ মহামারি মোকাবিলা এবং দেশের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ জেলাকে বসন্তমুক্ত ঘোষণা করা, ভয়ংকর কলেরা মহামারি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১ কোটি ৪০ লাখ ডলার প্রাপ্তি, গুদামে সারের মজুদ বৃদ্ধি, স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের নৌকা বিতরণ, চট্টগ্রামে সিমেন্ট শিল্পের বিকাশ, ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, আখ চাষের প্রসার, চোরাচালানিদেরকে জরিমানা ও কারাদণ্ড, ওষুধ কালোবাজারিদের শক্ত হাতে দমন, বেসরকারি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণের কড়াকড়ি প্রত্যাহার, বোরো মৌসুমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচলন বৃদ্ধি, গম নিয়ে গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বয় কার্যক্রম, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের জন্য ৭০ লাখ মণ গম বরাদ্দ, ২০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ দানের ঘোষণা, পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠন, ওষুধের আমদানি সহজীকরণ, মধ্যপ্রাচ্যে পোল্ট্রি রপ্তানি, হজযাত্রীদের নগদ সৌদি রিয়েল প্রদান ইত্যাদি ছিল মোশতাক সরকার ও আমলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এর ভালোমন্দ বিচারের ভার আপনাদের ওপর। এই সরকারের শাসনামলে পাকিস্তান থেকে ব্যাপক পরিমাণে ত্রাণ, খাদ্যশস্য ও কাপড় বাংলাদেশে এসেছে। পাকিস্তান ও মোশতাক সরকারের এহেন ইনটারেকশন নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ন্যারেটিভ প্রচলিত আছে যেটি আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন।